বস্তুসার
(Abstract)

আমাদের গবেষণা অভিসন্দর্ভের নাম 'মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকৃতি'। কেনই বা এই নাট্যকারকে বেছে নেওয়া হল তার উত্তরে বলা যায়, গণনাট্য-নবনাট্য পরবর্তী ১৯৫০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের ইতিহাসে একটা শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়। এই সময় সেই শূন্যতা পূরণ করতে যে কয়েকজন মৌলিক নাট্যকার তাদের সৃজনী প্রতিভা নিয়ে এগিয়ে এসে বাংলা নাটকে নতুন যুগ সৃষ্টি করেছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মোহিত চট্টোপাধ্যায় সমকালীন যুগ-যন্ত্রণা, জীবন-জিজ্ঞাসা, মানসিক-সামাজিক নানা দ্বন্দ্ব তাঁর লেখনীর সোনার কাঠির স্পর্শে নাটকে জীবন্ত রূপ দিয়েছেন। কবিতা দিয়ে তিনি জীবন শুরু করলেও নিজ প্রতিভার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করেন নাটক রচনায় এসে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর প্রথম জীবনে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার এক প্রধান কবিরূপে পরিচিত ছিলেন। 'আষাঢ়ে শ্রাবণে' (১৯৫৬), গোলাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' (১৯৬১), 'অঙ্কন শিক্ষা' (১৯৬১), 'শবাধারে জ্যোৎস্না' (১৯৬৫), এই কাব্যগ্রন্থগুলির মাধ্যমে তাঁর কবিখ্যাতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কিন্তু এমন সময়ে কবির মনে হল ''হঠাৎ আমার মনে হল আমি যে কবিতা লিখে চলেছি সেই কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারছি না। যেন একটা বৃত্তের মধ্যেই ঘুরছি। যে কোনো সৃজনশীল মানুষের পক্ষেই এটা খুব কষ্টকর। আমি আমার প্রার্থিত বদলটাকে কিন্তু পাচ্ছিলাম না কবিতার মধ্যে। ক্রমশঃ এক সময়ে নাটকই লিখলাম। ...'' (প্রমা-মোহিত চট্টোপাধ্যায় বিশেষ সংখ্যা-২০১৩, পৃ. ৯৫) এরপর থেকে কবি নাটক রচনায় মনোনিবেশ করলেন। সবাইকে চমকে দিয়ে ১৯৬৩ সালে গন্ধর্ব পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশ করলেন 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকটি। নাটক যেন কবিকে নতুন চোখ, নতুন ভাবনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দান করল।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এক ব্যতিক্রমী নাট্যকার। তাঁর নাটকের বিষয়, সংলাপ, চরিত্র ও জীবনের নানা দ্বন্দ্ব, জটিলতা, রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যা ও তার থেকে উত্তরণ— এককথায় মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের সামগ্রিক বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল লক্ষ্য।

আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটিকে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে গবেষণায় এগিয়ে যাওয়ার কথা ভেবেছি।

প্রথম অধ্যায় : মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমকাল

দ্বিতীয় অধ্যায়: মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মের পরিচয়, পর্ব বিভাগ এবং পাশ্চাত্যের বাস্তব বিরোধী দর্শন-সাহিত্য-নাট্যতত্ত্ব ও আন্দোলনের পরিচয়

তৃতীয় অধ্যায়: মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের নাটকের বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায় : মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের নাটকের বিশ্লেষণ

পঞ্চম অধ্যায়: অণুনাটকে অনন্যতা

ষষ্ঠ অধ্যায় : নাট্যসংলাপ
সপ্তম অধ্যায়: চরিত্র সৃজনের বিশিষ্টতা
অষ্টম অধ্যায়: জীবন দর্শন
নবম অধ্যায় : সমকালীন নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্রতা
মূল্যায়ন:

প্রথম অধ্যায়
মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সমকাল

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্য রচনার সূচনা কালে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল অন্যরকম। ঊনষাটের খাদ্য আন্দোলন, বাষট্টিতে ভারত-চীন সংঘর্ষ, চৌষট্টিতে ভারতীয় সাম্যবাদী দলের ভাঙন অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপে উত্তর আধুনিক নানা দর্শন চর্চিত হচ্ছিল, তার ঢেউ এসে এই দেশেও ধাক্কা দিয়েছিল। মননে, চিন্তায়, সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতিতে একটু অন্যরকম হাওয়া এসে লাগছিল। সংবেদনশীল কবি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের চেতনায় তার ছোঁয়া লেগেছিল তীব্রভাবে। এই সময় বাংলা নাটকেও কিছু যুগান্তর ঘটে গিয়েছিল। একদিকে গণনাট্য আন্দোলনের পরবর্তী নবনাট্য আন্দোলনে শম্ভু মিত্রের অবদান অন্যদিকে উৎপল দত্তের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক নাটকের প্রবর্তন ও লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রতিষ্ঠা। ঠিক এই সময়ের অব্যবহিত পরে বাদল সরকারের যুগান্তকারী 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটক লেখা হয়েছে। এছাড়াও সোমেন নন্দী ফরাসি নাট্যকার ইওনেস্কোর নাটকের বাংলা অনুবাদ করেছেন। এরূপ পরিস্থিতিতে বাংলা নাট্যজগতে মোহিত চট্টোপাধ্যায় পদার্পণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মের পরিচয়, পর্ব বিভাগ এবং পাশ্চাত্যের বাস্তব বিরোধী দর্শন-সাহিত্য-নাট্যতত্ত্ব ও আন্দোলনের পরিচয়

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সারাজীবনের নাটকের পরিচয় রয়েছে এই অধ্যায়ে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যজীবনকে দুটি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। নাট্যকার নিজেই বলেছেন— 'যদিও রাজরক্ত থেকে আমার নাটকের একটা অন্য পর্যায় এসেছিল।' (নাটক নিয়ে কথা অনুষ্টুপ, ১৪১১) প্রথম পর্বের নাটকগুলির মধ্যে ননরিয়ালিস্টিক জীবন দর্শন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। পাশ্চাত্যের বাস্তববিরোধী দর্শন, সাহিত্য ও নাট্য আন্দোলনের ব্যাখ্যা রয়েছে এই অধ্যায়ে। প্রথম পর্বের নাটকের মধ্যে 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'নীল রঙের ঘোড়া', মৃত্যু সংবাদ', 'গন্ধরাজের হাততালি' ইত্যাদি। 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড' থেকে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যজীবনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। এই পর্বে রাজনীতি এসেছে এবং রাজরক্তে

এসে তা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এছাড়া 'দ্বীপের রাজা', 'নিষাদ', 'বাঘবন্দী', 'ক্যাপটেন হুর্‌রা' নাটকেও রূপক, সংকেত, প্রতীক ও ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে সমাজ-রাষ্ট্র-রাজনীতির প্রকাশ ঘটেছে।

তৃতীয় অধ্যায়
মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পর্বের নাটকের বিশ্লেষণ

বাস্তবের উল্টোপথে হেঁটে মোহিত চট্টোপাধ্যায় ননরিয়ালিস্ট নাটককে বাংলা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর প্রথম পর্বের বেশিরভাগ নাটক পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাবে রচিত। এছাড়া পাশ্চাত্যের আধুনিক নানা দর্শন ও আন্দোলন যেমন ম্যাজিক রিয়ালিজম, অস্তিত্ববাদ, অ্যাবসার্ড, এক্সপ্রেশনিজম প্রভৃতিরও প্রভাব রয়েছে তাঁর নাটকে। বিদেশী নাটক ও দর্শনের কতটা প্রভাব রয়েছে তাঁর নাটকে, বিদেশী নাটকের সঙ্গে কতটা সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য রয়েছে তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ, বিস্তৃত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ রয়েছে এই অধ্যায়ে। এছাড়া নিজস্ব প্রতিভার গুণে তিনি কতটা মৌলিক নির্মাণ ও সৃষ্টি করেছেন তাও বিশ্লেষিত হয়েছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়
মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বের নাটকের বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় পর্বের নাটকে রাজনীতি এসেছে। শ্রেণিদ্বন্দ্ব, শ্রেণিশোষণ, শোষণের অভিনব কৌশল, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আদর্শ, দ্বন্দ্ব, পিছুটান, শোষণ-অত্যাচার, সমষ্টির জাগরণ, প্রতিবাদ-বিদ্রোহ প্রভৃতি বাস্তব বিষয় ননরিয়ালিস্টিক ভঙ্গিতে নাটকে এসেছে এই পর্বে। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কার্লমার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, অ্যান্টোনিও গ্রামসি, মিশেল ফুকো প্রমুখ ব্যক্তির চিন্তার সাহায্য নেওয়া হয়েছে এই পর্বের নাটকের বিশ্লেষণে।

পঞ্চম অধ্যায়
অণুনাটকে অনন্যতা

অণুনাটক লেখা এবং প্রচারে মোহিত চট্টোপাধ্যায় মনেপ্রাণে জড়িত ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের নাট্যজীবনে তিনি নানাকার্যে যুক্ত ছিলেন। অণুনাটকের প্রচার, প্রসার ও আন্দোলনে তাঁর অবদান অপরিসীম। ২০০৮ সালের ২২ শে জুলাই কলকাতায় জীবনানন্দ সভাঘরে এক আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে অণুনাটক বিকাশ মঞ্চ। পশ্চিমবঙ্গের অণুনাটককে কেন্দ্র করে যে একটা নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সে আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অণুনাটকের সংজ্ঞা, পরিচয় ও বিশ্লেষণ রয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
নাট্যসংলাপ

নাটকের সংলাপই যে সব, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কবিসত্তাকে বাদ দিয়ে তাঁর নাট্য সংলাপকে বোঝা যাবে না। তাঁর মতে কবিতা থেকে তিনি অনেক কিছু পেয়েছেন। ফলে তাঁর মনে হলো কবিতার যে ফর্ম আছে, সেই ফর্মকে নাটকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন নাটক কবিতা নয়, কিন্তু একটা শিল্পের অভিজ্ঞতা অন্য শিল্প রচনার ক্ষেত্রে কাজে দিতে পারে। তাঁর মনে হয়েছে তিনি কবিতার কাছ থেকে শূন্য হাতে ফিরে যাননি। কবিতার অভিজ্ঞতাকে মননে নিয়ে তিনি নাটকের উঠোনে পা রাখেন। কবিতায় কবিত্ববোধের যে বিস্তৃত ভূমিকা তাই তাঁকে সাহায্য করেছে নাটক লিখতে। কণ্ঠনালীতে সূর্য, মৃত্যুসংবাদ, গন্ধরাজের হাততালি, চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড, ক্যাপ্টেন হুর্‌রা প্রভৃতি নাটকে যে কাব্যময় সংলাপ তিনি ব্যবহার করেছেন তা বাংলা নাটকে এক স্বতন্ত্র নাট্যভাষার জন্ম দিয়েছে। বহু ব্যবহৃত শব্দকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারলে তা যথার্থ কবিতা হয়ে উঠতে পারে তা প্রায় সব কবিই মনে করেন। এখানেও সেই আবিষ্কার ছিল, যে আবিষ্কার দর্শক পাঠককেও মুগ্ধ করে। এই অধ্যায়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যসংলাপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়
চরিত্র সৃজনের বিশিষ্টতা

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভিতরের মানুষটাকে প্রাধান্য দেন। তাঁর মতে বাইরের মানুষটা সমাজের শেখানো নিয়মকানুন মেনে চলে। কিন্তু ভিতরের মানুষটা অনেকটাই আলাদা। তিনি তাঁর নাটকের 'ইনার রিয়েলিটি'র উপর জোর দিয়েছেন। তিনি তাঁর নাটকে এমন সব চরিত্রের আমদানি করেছেন যাদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ একটু অন্যরকম মনে হয়। তিনি মনে করেন এই ধরনের 'অন্যরকম' চরিত্ররা আমাদের গতানুগতিক অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে একটা বৈচিত্র্যময় আবহাওয়া সৃষ্টি করে, একটা আলোর সৃষ্টি করে। অচেনা কথা, অন্যরকম প্রকাশভঙ্গি আর এই অন্য আলোতে আগের মানুষগুলো বিস্মিত। তাদের গতানুগতিক জীবনে এলো পরিবর্তন। এই পরিবর্তনটাই উত্তরণ। এছাড়া সমাজ-রাজনীতির আবর্তে পড়ে অসহায়, বিপন্ন, বিধ্বস্ত মানুষের রুখে দাঁড়ানো, ঘুরে দাঁড়ানোটা তিনি অভিনবভঙ্গিতে দেখিয়েছেন।

অষ্টম অধ্যায়
জীবন দর্শন

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের চরিত্রদের গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে নাট্যকারের জীবনদৃষ্টির সমগ্রতা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। Totality of life অর্থাৎ জীবন দৃষ্টির সমগ্রতাকে ফুটিয়ে তুলতে গোটা মানুষটাকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', 'মৃত্যুসংবাদ', 'চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড', 'দ্বীপের রাজা' ইত্যাদি নাটকে যে দর্শনের জন্ম নিল পরবর্তী সময়ে 'রাজরক্তে' এসে তা পরিণত হল রাজনৈতিক প্রতিবাদের দর্শনে। যে জীবন দৃষ্টি মানুষকে খর্ব করে, পঙ্গু করে, বিধ্বস্ত করে, সেটার থেকে বেরিয়ে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী জীবন দর্শনের জন্ম নিল তারই বিশ্লেষণ রয়েছে এই অধ্যায়ে।

নবম অধ্যায়
সমকালীন নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনায় স্বতন্ত্রতা

বাংলায় গণনাট্য আন্দোলন (১৯৪৪-৪৮) যে নতুন যুগের সূচনা করেছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু গণনাট্যের ভাঙনের পর তাঁরা আর নতুনত্ব সৃষ্টি করতে পারেননি। তারপর তুলসী লাহিড়ী, ঋত্বিক ঘটকরা বাংলা থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারপরে প্রায় সত্তর দশক পর্যন্ত বাংলা থিয়েটারে মৌলিক নাটকের ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেই সময় বিদেশি নাটকের অনুবাদ ও রূপান্তরই ছিল গ্রুপ থিয়েটার গুলোর মূল অবলম্বন। এর অব্যবহিত পরেই বাংলা থিয়েটারে উৎপল দত্ত, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায় ও মনোজ মিত্রের আবির্ভাব ঘটে। এবং বাংলা নাটকে আবার সোনার দিন শুরু হয়। এই চারজন নাট্যকারের নাট্যপ্রতিভার মূল্যায়ন করে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মৌলিক স্বতন্ত্রতা কতটা— তা এই অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূল্যায়ন

মোহিত চট্টোপাধ্যায় শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নাট্যকার হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। এক জটিল সময়ের প্রেক্ষাপটে যুগ-জীবনকে তুলে ধরার সত্যনিষ্ঠ প্রয়াসে তাঁর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এক বিষণ্ণ সময়ে বিষণ্ণ জীবনকে জাগিয়ে তোলার তীব্র প্রয়াসে তাঁর নাটক যেন ম্যাজিকের মতন। ননরিয়ালিস্টিক জীবন দর্শন, অসাধারণ কাব্যগুণ সমৃদ্ধ ভাষা, বলিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা ও জীবন দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর নাটকে। এছাড়াও অসংখ্য শ্রেষ্ঠ অণুনাটকের জন্মদাতা তিনি। তাঁর এই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীলতার যুক্তিগ্রাহ্য বস্তুনিষ্ঠ মৌলিক বিশ্লেষণই আমাদের উদ্দেশ্য।